যোগাযোগ
দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দিশারী সংকল্প (বেলতলা পার্ক), বালুরঘাট, তুহিনশুভ্র মন্ডল, ৯৭৩৩২২৮৯৬৬
জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড বেচার ক্লাব, বয়াবস্তি, রাজা রাউত, ৯৪৭৪৪১৭১৭৮

বিজ্ঞান অন্বেষক

মো ঃ ৯৩৩২২৮০৬০২
১ ঘন্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ- ৬ সংখ্যা- ২ মার্চ-এপ্রিল /২০০৯ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

লবনে আয়োডিন কতটা জরুরি

একটা লবনের প্যাকেট হাতে নিলে তাতে দেখা যায় 'আয়োডাইজড সল্ট' (অর্থাৎ আয়োডিন সমৃদ্ধ লবন) কথাটা বড় বড় করে লেখা আছে। এখনকার লবনের ওপর বিজ্ঞাপনগুলোতেও জোর গলায় 'আয়োডিন যুক্ত লবন' কথাটা জোর গলায় বলা হচ্ছে। লবনে সত্যি আয়োডিন কতটা থাকবে অথবা আদৌ থাকাটা উপযুক্ত কিনা কিংবা লবন খাওয়া কতটা যুক্তিপূর্ণ তা আমাদের জানা দরকার।

উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষের জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ গুলি পরিচালনার জন্য শক্তির দরকার হয়। এই শক্তি আমরা যে খাবার খাই তা পুষ্টির মাধ্যমে দেহের কোষে কোষে তৈরি হয়। পুষ্টির জন্য খাদ্যের মধ্যে উপযুক্ত মাত্রায় শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ লবন ও জল থাকাটা জরুরী। মানুষের জৈবিক ক্রিয়াকলাপে শুষ্ক ওজনের প্রায় ১০ শতাংশ নানাপ্রকার অজৈব লবন (২০ রকমের) গুরুত্বপূর্ণ ভাবে অংশ নেয়। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, তামা, বোরণ, ক্লোরিন ইত্যাদির মতই আয়োডিনও তার মধ্যে একটি। আয়োডিনসহ এইসব খনিজলবন আমরা দৈনন্দিন খাবার টাটকা

এরপর ৮ পাতায়

ভারতে বিজ্ঞান চর্চার গোড়ার দিক

(অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী)

বুদ্ধিবৃত্তিতে উদ্ভাবন, স্বকীয়তা ও ভাবনাচিন্তার মাধ্যমে নিরন্তর পরিবর্তন/উৎকর্ষবিধান মানুষের সভ্যতাকে অভাবনীয় অগ্রগতি দিয়েছে। আগুনের আবিষ্কার, চাকার আবিষ্কার, পশুপালন, পাথরের অস্ত্র এবং সর্বশেষ কৃষিসভ্যতা মানুষের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থাকে আমূলভাবে বদলে দিয়েছে। মানুষের ইতিহাস বা ইতিহাসে মানুষ বা সভ্যতার ইতিহাস বা ইতিহাসে সভ্যতা — এই দু'ভাবেই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ আজ একটি প্রাসঙ্গিক চর্চা।

পৃথিবীতে নাকি এ পর্যন্ত ৮/১২টি সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। মিশরের পিরামিড আশ্চর্য প্রযুক্তির নিদর্শন হিসাবে আজও দাঁড়িয়ে। ফারাও রাজাদের সভ্যতা আজ ইতিহাসের গর্ভে। মহেনজোদারোর সভ্যতা থেকে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। এদেশে আর্যরা বহিরাগত — এই তত্ত্ব মেনে নিলে বলা যায়, এদের হাত দিয়ে যেমন প্রযুক্তি এসেছে; তেমনি আমাদের দেশীয় ভূমিপুত্রদের হাতেও অনেক প্রযুক্তি ছিল। আজ মিলেমিশে একাকার। কারা সুগন্ধি ধান বাসমতী, কামিনীভোগ, গোবিন্দভোগ সৃষ্টি করেছিলেন; এমন ২ লক্ষ জাতের ধান, ৪০ হাজার জাতের গম, কয়েকহাজার জাতের বাজরা, ভুট্টা, যব ইত্যাদি (অসংখ্য কৃষি বৈচিত্র্য (Agri-Bio Diversity) — তা আমাদের অজানা। তখন ছাপাখানা, লিপি নির্মাণ হয়নি। তালপাতার পুঁথিতে অল্প হলেও কিছু পাওয়া যায়।

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা তথ্য আমাদের জানা। নবম-দশম শতাব্দী থেকে মুসলমান শাসকরা ধীরে ধীরে ভারতের রাজনৈতিক মানদণ্ডকে অধিকার করে। প্রায় ৭/৮শ বছরে মুসলমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশেরও একটা ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। পাশাপাশি হিন্দু ঐতিহ্যও লুপ্ত হয়নি। ষোড়শ/সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত বহির্বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রণী ছিল। সিল্ক, পশম, কাঁসা-পিতল, হস্তশিল্প, মশলা ও অন্যান্য নানা বিষয়ে অগ্রণী ও সমৃদ্ধ ছিল। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল বলেই বিদেশীরা (ইউরোপীয় দস্যুরা) নানাভাবে লুঠপাঠ চালাত (স্থলে ও জলে। এবং এই সময়কালে তথাকথিত ইউরোপ ছিল অনুন্নত ও অসভ্য।

পরবর্তী অধ্যায় সংক্ষিপ্ত; কিন্তু অতিদ্রুত ইতিহাসের পট পালটে

এরপর ২ পাতায়

ধান গাছের পোকা

গত সংখ্যার পর

পোকার বিজ্ঞানসম্মত নাম — টাইপোরাইজা ইনমারটুলাস (Tryporyza incertulus)। বর্ণ- লেপিড়পটেরা (Order- Lepidoptera), পরিবার বা গোত্র - পাইরালিডিডী (Family- Pyralididae)। একে ইংরাজীতে বলা হয় Yellow Stem Borev, আর বাংলায় বলা হয় মাজরা পোকা।

অবস্থান — তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গে এদের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি।

খাদ্য-গাছ — এই মথ একমাত্র ধান গাছ আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে। এরা আমন ফসলের এতো ক্ষতি করে যে, এদেরই ধানগাছের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করা যায়।

আকৃতি এবং প্রকৃতি — এই মথ লম্বায় ১৫-২০ মিমি হয়, আর ডানার মাপ হয় ২৪-৫৫ মিমি। স্ত্রী মথ পুরুষ মথের চেয়ে আকারে একটু বড় হয়। গায়ের রঙেও কিছুটা তফাৎ আছে, যেমন- স্ত্রী মথের গায়ের রঙ উজ্জ্বল হলুদ, অথবা ঘিয়া রঙের, আর পুরুষের রঙ ফ্যাকাশে হলুদ।

জীবনকথা — এই জাতীয় মথ দিনের বেলায় ধান গাছের পাতার নিচে লুকিয়ে থাকে। আর সন্ধ্যার পরই সক্রিয় হয়ে ওঠে, এবং তখনই স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। স্ত্রী মথ মাত্র ৫-৭ দিন বেঁচে থাকে। কিন্তু এই সময়ের

এরপর ৬ পাতায়

ভারতে বিজ্ঞান চর্চা

১ পাতার পর

দিল। অসভ্য ইউরোপ সভ্য হোল। রজার বেকন প্রমুখের হাত ধরে আধুনিক বিজ্ঞান যাত্রারম্ভ করল। ফ্রান্সিস বেকন-এর দর্শন দিলেন। পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্ত — বিজ্ঞানের এই ধাপ অতিক্রম করে সত্যান্বেষণে এগোতে হবে। আপ্ত বাক্য; মেনে নেওয়া, তর্কহীন বিশ্বাস নয় — বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তিচিন্তার বিকাশ ঘটাতে হবে। চার্চের উপর বিশ্বাস ও আনুগত্য টলে গেল। কোপারনিকাস, টাইকোব্রাহে, গ্যালিলিও, কেপলার এবং আইজ্যাক নিউটন। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। এবং এল শিল্প বিপ্লব। মানুষ প্রথম আয়ত্ব/উদ্ভাবন করেছে প্রযুক্তি। পরে জেনেছে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য — বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ। আবার অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আগে এসেছে; পরে এসেছে প্রযুক্তি উদ্ভাবন। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি হাত ধরাধরি করে এগোয়। এবার আসি ভারতের কথায়। বৌদ্ধ সভ্যতার সূর্য অস্তমিত। এবং হিন্দু পুনরুত্থান। কী পেলাম? হিন্দু জাগরণ! সমুদ্র অস্পৃশ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য, সভ্যতার আদানপ্রদান স্তব্ধ। জাতপাতে আকীর্ণ। শ্রমজীবী উৎপাদক সমাজ নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, নিরক্ষর। একটা উন্নত ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে অতলে তলিয়ে গেল। নারী জাতির বিদ্যাচর্চা অধর্ম হিসাবে ঘোষিত হোল। সতীদাহ প্রথার মতো হাজারো বর্বর ঘটনা উঠে এলো ধর্মের মোড়কে; পুরুষশাসিত সমাজের নির্মম শোষণের হাতিয়ার হয়ে। মুসলমান ধর্ম তত্ত্বগতভাবে প্রগতিশীল ও উদারপন্থী। কিন্তু তারা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থায় কোনরকম হস্তক্ষেপ করেনি।

পলাশীর যুদ্ধ। ইংরাজের সূর্য উদীয়মান। আধুনিক প্রগতিশীল বিজ্ঞানচিন্তার বিস্তারের পটভূমি প্রস্তুত। রাজা রামমোহন রায় চিঠি লিখলেন লর্ড আমর্হাস্টকে — ইউরোপীয় বিজ্ঞান, অ্যালজেব্রা, ত্রিকোণমিতি, ইউরোপীয় ভূগোল চাই (১৮৮৩)। যথেষ্ট দ্রুততায় প্রায় হাজার বছরের জগদ্দল গড্ডালিকার অন্ধবিশ্বাসকে সরানোর কাজ শুরু হল। বাংলার নবজাগরণ — এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে জন্ম ও বিস্তার।

এই লেখায় সংক্ষিপ্তভাবে ভারতে আধুনিক সময়কালে (ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত) মুখ্যত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের গবেষণার যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তার একটি তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৭২৩-২৭ — দিল্লী, উজ্জয়িনী, মথুরা, বেনারস, জয়পুর — এই পাঁচ জায়গায় বৃহৎ আকারে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ও পরিমাপের জন্য মহারাজা সোয়াই জয়সিং (২) কর্তৃক মানমন্দির স্থাপন। এইকাজে সমকালীন ইউরোপীয়/আরবীয় জ্ঞানও ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৭৩৭ — দক্ষিণ ভারতের ম্যাপ তৈরি — d'Anville কর্তৃক। (মোরাখা স্কুল অফ অ্যাস্ট্রোনমি ও মিশনারিদের সংগৃহীত তথ্যাদি ব্যবহার করে।)

১৭৫৫ — উদ্ভিদ বিষয়ক অনুসন্ধান — দক্ষিণ ভারতে কোয়েনিগ কর্তৃক। এইসব তথ্যাদি সুইডেনের লুন্ড শহরে রক্ষিত আছে।

১৭৬১ — চট্টগ্রামের উপকূলে তটরেখার সমীক্ষা।

১৭৬৪ — রেনেল কর্তৃক গঙ্গানদীর গতিপথের বিস্তৃত সমীক্ষা। (ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সহায়তায়।)

১৭৭৩ — ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ শুক্রগ্রহের সংক্রমণ (transit of venus) পর্যবেক্ষণ করে ভারত থেকে।

১৭৮৩ — রেনেল কর্তৃক সর্বপ্রথম ভারতের ম্যাপ প্রস্তুত। (অবিভক্ত ভারতবর্ষ)।

১৭৮৪ — এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। নবগঠিত সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি ভারতপ্রেমী স্যার (১৫ জানুয়ারি) ইউলিয়াম জোন্সের হাতে। ১৮০৮ সালে পার্কস্ট্রীটে বাড়ি নির্মিত হয়।

১৭৮৭ — শিবপুর (হাওড়া) রয়াল বেটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা। রবার্ট কিড ছিলেন এর প্রথম অবৈতনিক সুপারিনটেন্ডেন্ট।

১৭৮৮ - ১৮৩৯ — এশিয়াটিক রিসার্চেস নাম নিয়মিতভাবে গবেষণাপত্র প্রকাশিত হতে থাকে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে।

১৭৮৯ — The Design of a Treatise on the plants of Indi — উইলিয়ম জোনস লিখিত এই বই ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে প্রথম বিশ্বের সামনে তুলে ধরে।

১৭৯২ — মাইকেল টপিং (Toppins) কর্তৃক মাদ্রাজ অবজারভেটরি মানমন্দির স্থাপন।

— জেমস রেনেলের লেখা বই — Memoir of a map of Hindusta প্রকাশিত হয়। এই বইতে ৩৫ বছর সময়কালে কোম্পানি কর্তৃক ভারতের ২০০০ মাইল লম্বা সমুদ্রতীর ও ৫০০ মাইল লম্বা দ্বীপপুঞ্জের জরিপের তথ্যাদি নথিভুক্ত আছে।

১৭৯৩-৯৪ — উইলিয়াম রক্সবার্গ শুরু করেন বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্ভিদ অনুসন্ধান ও নথিভুক্ত করণের সুবৃহৎ কাজ। তিনি ছিলেন রয়াল বোটানিক গার্ডেনের সুপারিনটেন্ডেন্ট।

১৭৯৪ — মাদ্রাজ সার্ভে স্কুলের প্রতিষ্ঠা। ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সমীক্ষা পর্বের শুরু।

১৭৯৪ — প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম। কয়লা, নুন, জাহাজ শিল্প ও ইংরাজদের সঙ্গে নানা ব্যবসায় সাফল্য অর্জন। অসাধারণ উদ্যোগী পুরুষ ও শিল্প-বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক। উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষার প্রসারে বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৮০০ — মাদ্রাজে ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে দপ্তর প্রতিষ্ঠা।

১৮১৩ — ভারতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (Promotion of the knowledge of Science) উন্নয়নে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বছরে একলক্ষ টাকা ব্যয় করবে — ঘোষণা। কোম্পানির সনদ নবীকরণ হয়।

১৮১৪ — নাথানিয়েন ওয়ালিচ হলেন রয়াল বোটানিক গার্ডেনের সুপারিনটেন্ডেন্ট। এঁর উদ্ভিদ সংগ্রহের নমুনা ইউরোপের নানা কেন্দ্রে পাঠানো হয় বিস্তৃত অনুসন্ধানের জন্য।

১৮১৫ — ল্যাম্বটন কর্তৃক ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের (Southern Region) ম্যাপ প্রস্তুত। সর্বোচ্চ মধ্যরেখার জ্যা পরিমাপ। (Measurement of the largest meridonial arc)

১৮১৭ — কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা রাজা রামমোহন রায়ের

এরপর ৩ পাতায়

ভারতে বিজ্ঞান চর্চা

২ পাতার পর

উদ্যোগে। উদ্দেশ্য-পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন। ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞানের শিক্ষার ভিত্তি শুরু।

১৮১৮ — কলকাতায় 'গ্রেট ট্রিগোনো মেডিক্যাল সমীক্ষা' পর্যদের সূচনা। প্রতিষ্ঠাতা — ক্যাপটেন উইলিয়াম ল্যাম্বটন।

১৮২০ — কলকাতার আলিপুরে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির পত্তন। প্রতিষ্ঠাতা — উইলিয়ম কেরী ও রামকমল সেন।

১৮২২ — ভারতের (অবিভক্ত) অ্যাটলাস (মানচিত্র) প্রকাশ। স্কেল ১/৪ ইঞ্চি।

১৮২৩ — নবজাগরণের পথিক রাজা রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক চিঠি লর্ড আর্মহার্স্টকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য। টোল মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধিতা।

১৮২৯ — বর্ধমানের লৌহ আকরিকের খনিজ বিশ্লেষণ করেন হেনরি পিডিংটন। অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার তামার আকরিকের খনিজ বিশ্লেষণ করেন জেমস প্রিন্সেপ।

১৮৩০ — গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভের সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন জর্জ এভারেস্ট। এখানেই রাধানাথ সিকদার প্রথম হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয় করেন। এভারেস্ট নিজে এই পরিমাপের জন্য স্বতন্ত্র পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলে, যা রাধানাথ সার্থকভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

১৮৩৩ — ডা. মহেন্দ্র লাল সরকারের জন্ম। এঁর উদ্যোগে ভারতে সর্বপ্রথম দেশীয় চেষ্টায় বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণাগার (The Indian Association for the cultivation of Science) গড়ে ওঠে ১৮৭৬ সালে। মৃত্যু- ১৯০৮।

১৮৩৫ — কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা। ডা. ব্রামলে প্রথম অধ্যক্ষ। সর্বসাধারণের জন্য আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার প্রথম সুযোগ। এখানে মেডিকেল শিক্ষার (ডিগ্রী) ব্যবস্থাও ছিল। — মেকলের মিনিট প্রকাশিত হয়। ভারতে ইংরাজি হবে শিক্ষার বাহন। সরকারি কাজ হবে ইংরাজিতে।

১৮৩৯ — জামসেদজি নাসের ওলানজি টাটার জন্ম। ভারতে আধুনিক শিল্পোদ্যোগে এঁর উদ্যোগ যথেষ্ট। (মৃত্যু - ১৯০৮)

১৮৪৩ — মাদ্রাজে মেডিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা।

১৮৪৪ — কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা চারজন ছাত্রের উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত গমন।

১৮৪৫ — বম্বেতে 'গ্রান্ট মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা (কলেজ)।

১৮৪৭ — উত্তরপ্রদেশের রুরকিতে ইনজিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন। পরে নামকরণ হয় — থমসন ইনজিনিয়ারিং কলেজ।

১৮৪১ — প্রথম ভারতীয় এফআরএস - আর্দেসির কারসেটজি (১৮০৮-৭৭)। নৌচালনায় স্টিম ইঞ্জিনের বিষয়ে গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব।

১৮৪৫ — কোলাবা অবজারভেটরি স্থাপন। ১৮৯৬-তে এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হন নানাভাই আর্দেসীর প্রেমজি মুস। তাঁর আগে ডিরেক্টর ছিলেন চার্লস চেম্বার্স। ভূচুম্বকত্ব বিষয়ে এঁদের সংগৃহীত তথ্যাদি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৮৫১ — ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা পর্যদের স্থাপনা কলকাতায়। প্রথম সুপারিনটেন্ডেন্ট টমাস ওল্ডহ্যাম। ভারতে খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানে এই সংস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

— ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন সংযোগ স্থাপিত হয় কলকাতা ও ডায়মন্ডহারবারের মধ্যে। রূপকার উইলিয়ম ও সাউঘনেসি।

১৮৫৩ — বোম্বে থেকে থানে প্রথম রেলপথ স্থাপন। এইকাজ ভারতের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করে।

১৮৫৪ — উডস ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার আর্জি জানানো হয়। মডেল হবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়। পুনায় ইনজিনিয়ারিং স্কুল স্থাপনা।

১৮৫৬ — শিবপুর হাওড়ায় বেঙ্গল ইনজিনিয়ারিং কলেজ উঠে আসার পূর্বে রাইটার্স বিল্ডিং-এ এর কার্যারম্ভ ঘটে। ১৮৬৫ থেকে ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে। হাওড়ায় উঠে আসে ১৮৮০।

১৮৫৭ — কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ ভারতের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। একমাত্র কাজ হবে অনুমোদন দেওয়া ও পরীক্ষাগ্রহণ।

১৮৫৯ — মাদ্রাজে সিভিল ইনজিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৬০ — কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রতিষ্ঠা। প্রথম দিককার বিজ্ঞান শিক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার ল্যাঁকোর অসামান্য অবদান আছে।

১৮৬১ — ভারতীয় গ্রহতত্ত্ব সমীক্ষা (Archaeology) পর্যদের স্থাপন। লর্ড ক্যানিংহাম এর সার্ভেয়ার নিযুক্ত হন।

১৮৬৩ — ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গল চ্যাপটার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৬৭ — কলকাতায় ভারতীয় সংগ্রহশালার (Indian Musuam) সূচনা। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে গ্যালারি উন্মোচন হয় ১৮৭৮ সালে।

১৮৭৩ — আলেকজান্ডার পেডলার প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের শিক্ষা ও গবেষণার কাজ শুরু করেন। কেউটে সাপের বিষ, ফসফরাসের আলোক সুবেদী বিক্রিয়া, সীসার আচ্ছাদনের ক্ষয় — এসব গবেষণায় তিনি যথেষ্ট সাড়া জাগাতে সক্ষম হন।

১৮৭৫ — কলকাতায় ভারতীয় আবহদপ্তরের (Dept. of Meterlogy) প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৬ — ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার (Indian Association for the Cultivation of Science) প্রতিষ্ঠা ২১০ নং বৌবাজার স্ট্রীটে (বর্তমানে যেখানে গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স)। প্রধান উদ্যোক্তা ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার।

১৮৮০ — প্রমথনাথ বসু (১৮৫৫-১৯৩৪) প্রথম ভারতীয়, যিনি বিদেশী বৈজ্ঞানিক জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। (1) Undescribed Fossil carnivoca from Sivallie Hills in the collection of the British Musuem – The quarterly Journal of the Gelogical Soc of London. Feb, 1980. (2) Notes on the History and Comparative Anatomy of the Extimet

এরপর ৫ পাতায়

মোবাইল : একটি চলমান বিপদের ধারাবিবরণী

পুস্তক সমালোচনা

সবুজ মুখোপাধ্যায়
বিজ্ঞান অন্বেষক, চাকদা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ।। এপ্রিল ২০০৮

ঝকঝকে সুন্দর প্রচ্ছদ, ছোট্ট মাপের বই, দেখলেই হাতে তুলে নিতে ইচ্ছে করে, ঠিক নতুন মডেলের মোবাইলের মতোই। আধুনিক জীবনযাপনে মোবাইল ফোনের সুবিধা আর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই সেকথা লেখকও স্বীকার করেছেন। আজকাল অধিকাংশ পরিবারই ছোট, দৈনন্দিন সমস্যা-সংকট নিয়ে হিমশিম খেতে হয়। রাস্তাঘাটে অসুস্থতা, স্কুল-কলেজ-টিউশন পড়তে যাওয়া ছেলেমেয়ে, ব্যবসায় অর্ডার সাপ্লাই, আপৎকালীন দুরবস্থায় থানা পুলিশ হাসপাতালে যোগাযোগ, বাড়ির কাজের লোক, কলের মিস্ত্রি, ইলেকট্রিকের লোক, গ্রামের বাড়ির খবরাখবর ... এরকম অজস্র ক্ষেত্রে মোবাইল আজকাল প্রচুর সুবিধা এনে দিচ্ছে নিঃসন্দেহে, গ্যাস, টিভি কম্পিউটারের মতো প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠছে। এসব কথা কে না জানে। কিন্তু যে-কথা অনেকেই সেভাবে স্পষ্ট করে জানে না — মোবাইলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা — সেটা ঠিকঠাক জানা এবং জানানো অত্যন্ত জরুরী। এই জরুরী কাজটাই করার চেষ্টা হয়েছে এই বইতে। ছোট সংগঠন বড় কাজ করতে নেমেছে, যে-কাজ বড় সংস্থা বা ওপর মহল কেউই করছে না, করার ইচ্ছাও বোধহয় নেই। আসল মুশকিলটা হল, মোবাইলের জনপ্রিয়তা যে হারে বাড়ছে, বাচ্চাবুড়ো সবাই যেরকম ফুর্তিতে মোবাইলে ডুবে যাচ্ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে বিপদও বাড়ছে, অদৃশ্য শক্তিশালী তরঙ্গ যে ক্রমাগত শরীরের ক্ষতি বাড়াচ্ছে — সে বিপদ নিয়ে মানুষের যেন কোনো হেলদোল নেই; দরকারি ভীতিটা সেভাবে ছড়াচ্ছে না, সম্ভবত এই বিপদবার্তা নিয়ে জনচেতনা প্রসারের কাজ তেমন হচ্ছে না বলেই। এ কাজে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের হাত ধরেই প্রযুক্তি আসে, আবার প্রযুক্তির ভালোমন্দ বিচারও করে দেয় বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞানকর্মীদের দায়িত্ব এসে পড়ে সবার আগে, কারণ প্রযুক্তিবিদ বা রাজনীতিবিদরা যা বলবেন তাতে পক্ষপাতিত্ব থাকবে, ঢেকেরেখে চালাকি করে বলা হবে। গণবিজ্ঞানকর্মীদের সে বালাই নেই। তাদের অবলম্বন যে বিজ্ঞান তাতে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। বিজ্ঞান সর্বদাই সত্যকে তুলে ধরে তথ্য-প্রমাণ দিয়ে।

সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে গেলে দুটো বিষয় সবার আগে দরকার হয় — এক, সহজবোধ্য ভাষায় সাবলীল ব্যাখ্যা; দুই, নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য তথ্য যা নিয়ে মানুষের মনে সংশয় বা দ্বিধা থাকবে না। এই দুটো শর্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা কঠিন হলেও সেই কঠিন কাজই নিপুণভাবে করতে হয়, না হলে সর্বস্তরের শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণের মনের ভেতর ঢোকা যায় না, ভরসা আদায় করা যায় না পরিপূর্ণভাবে। আর, বিজ্ঞানকর্মীদের দেওয়া তথ্যে ফাঁক-ফোকড় বা দুর্বলতা থাকলে মোবাইল-দূষণের ভীতিও বাঞ্ছিত মাত্রায় তৈরি হবে না, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এই ছোট বইটিতে সনিষ্ঠ প্রচেষ্টার অভাব না থাকলেও কিছু বড় ফাঁক নজরে এলো, সেগুলো উল্লেখ করা দরকার বলে মনে করছি।

বিজ্ঞানের বক্তব্যের তথ্যে প্রামাণ্যতাই বড় শক্তি, তাই তথ্যসূত্র না থাকলে সে তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা দুর্বল হয়ে যায়। এ তো ধর্মগুরুর বাণী কিংবা নেতা-মন্ত্রীর ভাষণ নয় যে একটা কথা বলে দিলেই বেদবাক্য হয়ে গেল! ওনাদের কথার যাচাই প্রমাণের দরকার পরে না! কিন্তু আমরা যে বিজ্ঞানের কথা বলছি, সত্যকে জানানোর কথা, যে-কেউ যাচাই করে নিতে পারবে। এই বইতে বহু তথ্য দেওয়া হয়েছে, বহু বিদেশী সমীক্ষা গবেষণার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু একটিরও কোনো তথ্যসূত্র নেই। বড় ফাঁক এখানেই। শারীরিক কুফলের বিস্তর উল্লেখ রয়েছে — তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ দেহের কোষকলার ক্ষতি করে; মগজের টিস্যুকে নষ্ট করে; শরীর পঙ্গু হয়ে যেতে পারে; শ্রবণ-শক্তি, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হতে পারে, তাতে স্মৃতিশক্তি হ্রাস, লিউকিমিয়া ও ব্রেন-টিউমারের আশঙ্কা দেখা দেয়; এমনকি কোমড়ে মোবাইল রাখার দরুন তরুণদের শুক্রাণু তৈরির ক্রিয়াও ব্যাহত হতে পারে। ভয়ঙ্কর সব বিপদের বার্তা। আরো জানা যাচ্ছে যত্রতত্র খাড়া হয়ে ওঠা মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণ দূষণের কথা। অনিদ্রা, চোখের ব্যথা, গা বমি ভাব, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট, অন্যদিকে গরুর দুধ কমে যাওয়া, গর্ভপাত হওয়া, পায়রা চড়ুই শালিক চিল মরে যাওয়া — এসব যে শক্তিশালী টাওয়ারের বিকিরণ থেকে হতে পারে তা সাধারণ মানুষ জানেন ক'জন? এ বই সেসব আতঙ্কজনক তথ্য এনে দিচ্ছে বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ ব্যাখ্যা ও তথ্যসূত্র না থাকায় এসবের সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ থাকছে না। পাঠককে লেখকের কথাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হচ্ছে। এটা বিজ্ঞানের পদ্ধতি নয়। এই ফাঁক দিয়েই অসৎ তাঁবেদার বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদ আর মোবাইল কোম্পানীর কৌশলী প্রচার ঢুকে পড়ে। কোনো সমর্থিত তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই তারাও বেমালুম বলে দিতে পারে 'মোবাইলের বিপদ নিয়ে এখনো কিছু প্রমাণিত হয়নি, এসবের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই' ইত্যাদি। মানুষ ধন্দে পড়ে যায়।

মোবাইল নামক 'চলমান বিপদ' নিয়ে সত্যিকারের ভীতিটা মানুষের মনের গভীরে ঢোকাতে হলে সাধারণের চেনা উদাহরণ দিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যটাকে প্রশ্নহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। সেখানে তথ্য বিশ্লেষণে অসম্পূর্ণতা থাকলে চলবে না। এ বই-এর সব কটা উদাহরণই বিদেশি। মনে হতেই পারে — ওসব সাহেবদের ব্যাপার, আমাদের তো নয়! বিপদটা কেন হয়, কীভাবে শরীরে বিকিরণ বিপদ ঘটায়, তার সরল পরিচয় না পেলে মনে অপূর্ণতা থেকে যেতেই পারে। বই-এর বেশ কয়েক পাতা ধরে আর্থার ফাস্টেনবার্গের কাহিনী বলা হয়েছে (কোন্ দেশের লোক তা বলা নেই), পড়লে চমকে যেতে হয়। কিন্তু যদি কারুর মনে প্রশ্ন জাগে — অপারেশন থিয়েটারে সব সময়ই তো কতো ডাক্তার, কতো স্বাস্থ্যকর্মীকে কাজ করতে হয়। আর্থারের এই অসুস্থতা যে বিকিরণের জন্যেই ঘটেছে, অন্য কোনো শরীরিক কারণে নয়, তার প্রমাণ কী? বইতে সে প্রশ্নের জবাব নেই।

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফসল হিসেবে নতুন নতুন প্রযুক্তির

এরপর ৫ পাতায়

পুস্তক সমালোচনা ঃ মোবাইল

৪ পাতার পর

বিকাশ অপ্রতিরোধ্য। সে এগোবেই। আবার, প্রযুক্তি যতই উন্নত হবে তার অনুষঙ্গে কিছু বিপদ আসবেই অনিবার্যভাবে। সে বিপদ মোকাবিলার জন্য প্রাথমিক কাজ হল বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা এবং সাবধানতা, তারপর আসে ক্ষতিকারক প্রযুক্তির প্রতিরোধ। এ লড়াই সহজ নয়, লড়াকু কর্মীদের নিজেদের তৈরি হতে হয় উপযুক্তভাবে। যেখানে প্রযুক্তি ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ে সেখানে কাজটা আরও কঠিন হয়। আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহে আনতে হয়। লেখক বইটিতে সঙ্গতভাবেই পরমাণুপ্রযুক্তির কথা এনেছেন, দেশে-বিদেশে মানুষের প্রতিরোধের কথাও বলেছেন। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে পরমাণুচুল্লী বা কীটনাশক উৎপাদক কিংবা রাসায়নিক 'হাব' রাষ্ট্রের সরকার মানুষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়, বৃহৎ তার আয়োজন, কোনো শুভবুদ্ধির নাগরিক এই বৃহৎ প্রযুক্তি চেয়ে নেয় না, কিন্তু মোবাইল নেয়। মোবাইল প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ সুবিধাটা এত বেশি যে পরোক্ষ বিপদটা বোঝানো বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিজ্ঞানকর্মীদের লড়াইটাও বেশ কঠিন হয়।

শেষে আরেকটা কথা বলি। সরলীকরণের প্রবণতা পরিহার করা ভালো। ... 'প্রথম বিশ্বে বর্জিত প্রযুক্তি তৃতীয় বিশ্বে চালান' — এটা এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক পরিচিত কৌশল। তাবলে এই বর্জ্য চালানের তত্ত্ব সমস্ত রকম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একই ফর্মুলায় প্রয়োগ করলে অতি-সরলীকরণের দোষ এসে যাবে। মোবাইল প্রযুক্তি প্রথম বিশ্ব বা ধনী দেশগুলোতে আদৌ বর্জিত নয়, বরং একটার পর একটা নতুনতর প্রযুক্তিকৌশল বাজারে আসছে (সেখানকার সচেতন সমাজের প্রতিবাদী কলরব সত্ত্বেও)। সাধারণ মোবাইল থেকে আই-পড, আই-ফোন, এল জি জি, টিভি-ফোন-নিত্য নতুন বাহার আসছে, বাজারও পাচ্ছে ওদেশে। আর সেইসঙ্গে সাবেকি 'ল্যান্ডফোন' সাহেবদের দেশে প্রায় উঠেই যাচ্ছে। আমাদের দেশে বা তৃতীয় বিশ্বে নিত্য নতুন মোবাইল যে হুড়মুড় করে চলে আসছে তা জোর করে চালান করা নয়, আসছে বাজারের টানে, লোকে চাইছে, কিনছে, তাই।

সুতরাং মানুষকে কেবল বিপদের কথা বলে আতঙ্কের চিত্র তুলে ধরে মোবাইল বর্জন করানো বেজায় মুশকিল। তবু মুশকিল বলে লড়াই ছাড়লে চলে না। গণবিজ্ঞানকর্মীরা বরং মোবাইল টাওয়ার বসানোর নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সরাসরি আওয়াজ তুলতে পারেন সংগঠিতভাবে। সেটা অনেক বাস্তবসম্মতও বটে। লোকালয়ে বা জনবসতির গা ঘেঁষে টাওয়ার বসানো চলবে না, মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের, উন্নয়নের নামে মোবাইল কোম্পানীকে যেখানে খুশি টাওয়ার বসানোর প্রশাসনিক ছাড়পত্র দেওয়া চলতে পারে না, আত্মরক্ষার স্বার্থেই মানুষকে প্রতিরোধের রাস্তায় নামতে হয় — এরকম দাবি তুলে সচেতন আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে। এবং সে সময় এই ছোট্ট বইটি যথেষ্ট বড় ভূমিকা নিতে পারে।

— অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে বিজ্ঞান চর্চা

৩ পাতার পর

Carnivora – Geological Magazine. Vol. VIII, 1880.

১৮৮১ — আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (মাত্র ১৭ বছর বয়সে) প্রথম গণিত বিষয়ক গবেষণাপত্র প্রকাশ — মেসেঞ্জার অফ ম্যাথামেটিকস পত্রিকায়।

১৮৮৪ — এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষপূর্তি। বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু সম্পাদিত — The Centenary Review of the Researches of the Asiatic Society of Bengal in Natural Sciences (২০০ পৃঃ প্রায়) ৩য় খন্ড, প্রকাশ। এতে রয়েছে (ভৌতবিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে ৫০০ গবেষণা পত্রের তালিকা, জীববিদ্যায় ৫০০, উদ্ভিদবিদ্যায় ৩২০টি (১৭৮৮-১৮৮২ সময়কাল)

১৮৮৭ — ডা. রাধাগোবিন্দ করের চেষ্টায় কলকাতা মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে এর নাম আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ। শ্রী নিবাস রামানুজনের জন্ম মাদ্রাজে। ভারতীয় গণিত প্রতিভাধরদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। ভারতের দ্বিতীয় এফ আর এস (১৯১৮)। মৃত্যু- ১৯২০।

১৮৯২ — বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা — ভারতের প্রথম ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান।

১৮৯৫ — তারহীন বেতার সঙ্কেত প্রেরণ — জগদীশচন্দ্র বসুর পরীক্ষা প্রদর্শন ও গবেষণাপত্র প্রকাশ।

১৮৯৫-৯৭ — প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১১টি গবেষণাপত্র মারকিউরাস নাইট্রাইট বিষয়ক প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ — পশুচিকিৎসা ও গবেষণার প্রথম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বেলগাছিয়ায় বেঙ্গল ভেটেরানারি কলেজ।

১৮৯৮ — ডা. রোনাল্ড রস কর্তৃক কলকাতায় ম্যালেরিয়া রোগের কারণ নির্ণয়। ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। উনিশ শতকের শেষে এদেশে ১৭০টি বিজ্ঞান শিক্ষার কলেজ, চারটি মেডিক্যাল কলেজ, ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৫০টি ইনজিনিয়ারিং ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

— দীপক কুমার দাঁ

ধান গাছের পোকা

১ পাতার পর

মধ্যেই ধান গাছের আগার দিকে কচি পাতার নিচের দিকে ২০০-৩০০টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি থোকায় থোকায় সাজানো থাকে। এইরকম ২-৫টি থোকা থাকে এবং প্রত্যেকটি থোকায় ৬০-১০০টি ডিম থাকে। স্ত্রী মথ তার শরীরের ছোট ছোট হাল্কা হলুদ রঙের বেশমি রোম দিয়ে ডিমগুলি ঢেকে রাখে। সদ্যোজাত ডিম ডিম্বাকার এবং চ্যাপ্টা। রঙ প্রথম দিকে মলিন সাদা থাকে, কিন্তু ক্রমশ গাঢ় বাদামি হয়ে যেতে থাকে। প্রায় ৬-৮ দিন পরে ডিম ফুটে ছোট্ট কালো মাথাওয়ালা হাল্কা হলুদ রঙের শূককীট বা শুঁয়াপোকা বেরোয়। সদ্যোজাত শুঁয়াপোকা একটা সুতোর সাহায্যে ধানগাছের পাতা থেকে ঝুলে থাকে এবং প্রায় ১০ সেমি ব্যাসার্ধ পরিমিত জায়গার মধ্যে, হাওয়ায় দোল খেতে থাকে। আর সুযোগ পেলেই একটা সুবিধামত জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। কেউ কেউ আবার পাতার উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে।

এরপর ৬ পাতায়

হারিয়ে যাওয়া ধানের খোঁজে

গত সংখ্যার পর

বিচালি ভাল। মুড়ি, চিঁড়া, খই ভাল হয়।

একটু পুরানো বয়স্ক মানুষের কাছে দেশি ধানের কথা জিজ্ঞেস করলে, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। পুরানো সেই দিনের কথা বলতে শুরু করেন পরম মমতায়। যেন একান্ত আপন, আত্মীয়ের মতো। আর হা-হুতাশ করেন বর্তমানের কৃত্রিম চাষের সর্বগ্রাসী অসহায়তার কাছে।

পুরানো দিনের ধান চাষের কথা জানতে হাজির হয়েছিলাম বিশিষ্ট কৃষিবিদ গণেশচন্দ্র সরকারের কাছে। হাজির করলেন এক বিরাট তথ্যভাণ্ডার।

দেশি পুরানো আউস ধানের নাম — ১) বেনাঝুপি, ২) সমুদ্রবেড়ী, ৩) ধারিয়াল, ৪) কপিলেশ্বর, ৫) দুলার, ৬) কেলেপরাঙ্গী, ৭) আগুনবান (সূর্যমণি), ৮) তুলসি শাল, ৯) পিঁপড়ে কেলে, ১০) ফাঁপতি কেলে, ১১) রুয়ে কেলে, ১২) লাল বোরো, ১৩) কেলে বোরো ইত্যাদি। (কেলে কথার অর্থ — কালো জাতের ধান, লাল অর্থে লালচে ধান)।

দেশি পুরানো আমন ধানের নাম — ১) বাদ কলমকাটি, ২) চূর্ণকাটি, ৩) পাটনাই, ৪) নাগরা, ৫) কামিনীভোগ, ৬) রঘুশাল, ৭) ঝিঙাশাল, ৮) কলমা (সাদা), ৯) ভাসামানিক, ১০) রূপশাল, ১১) তিলক কাচারি, ১২) আছড়া, ১৩) কুমড়োগোড়, ১৪) সীতাশাল, ১৫) ক্ষীরপুলি, ১৬) কালোজীরে, ১৭) মুরগীর ঝোল, ১৮) চামরমণি, ১৯) দুধেনাগরা, ২০) লাঠিশাল, ২১) কার্ত্তিকশাল, ২২) বগিলাল পাটনাই, ২৩) কাটারাঙ্গি, ২৪) কটেনাগরা, ২৫) বেগুনবীচি, ২৬) চেনী কানাই, ২৭) খেজুরছড়ি, ২৮) বাদশা ভোগ, ২৯) পেসারি পাটনাই, ৩০) গোবিন্দ ভোগ, ৩১) বাসমতি, ৩২) সোলির পোনা, ৩৩) গেতিশাল, ৩৪) তিলক ভোগ, ৩৫) তিলক কাঠি, ৩৬) সিলঞ্চি, ৩৭) লাল কলমা, ৩৮) দুধেশ্বর।

দেশি আমন ধান — বেশি জলের — ৪০) কইজোড়, ৪১) দুর্গাভোগ, ৫০) ধূলাগেতী, ৫১) কালান্দী, ৫২) করিমশাল, ৫৩) নাজিরশাল, ৫৪) কাইচেন, ৫৫) গোলাপসরু, ৫৬) তিলকাজল, ৫৭) ক্ষীরকুন্দি, ৫৮) দাদকানি, ৫৯) আম্রপালি, ৬০) পান্তাভোগ, ৬১) জোড়ী, ৬২) জামাই ধান, ৬৩) আকোন্দী, ৬৪) সুরেশ পাটনাই, ৬৫) বয়ারবাট, ৬৬) কালোভেটী, ৬৭) উড়িচাতরা, ৬৮) রূপশালি, ৬৯) লাল জেওড়া, ৭০) সাদা জেওড়া, ৭১) বিষ্ণুভোগ, ৭২) বাঁশফুল, ৭৩) গন্ধমালতী, ৭৪) কনকচূড় ইত্যাদি।

আমাদের জেলায় (শুধু উত্তর ২৪ পরগনায়) লুপ্ত ধানের নাম সংগ্রহ করলে এই সংগ্রহ ৫০০-র বেশি ছাড়িয়ে যাবে। সারা পশ্চিমবঙ্গ ধরলে এই সংখ্যা ৩০০০ প্রায় হতে পারে। এই বিশাল বৈচিত্র্যমণ্ডিত উদ্ভিদ গুণাবলী আজ লুপ্ত প্রায়। ৯০ শতাংশ ইতিমধ্যে (মাত্র ৩০ বছরে) লুপ্ত হয়ে গেছে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণে।

বেশ কিছু দেশি ধানের জাত বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে নিচে উল্লিখিত হল —

(ক) আমন ধান

১) কেলে ধান — আউস। চাল বেঁটে, মোটা, গোল। ভাত খুব মিষ্টি। ভাল মুড়ি ও খই হয়। খড় লম্বা, ঘর ছাওয়া যাবে। ভাদ্র মাসে ওঠে। ফলন- ৫/৬ মন বিঘা। ২) আজান — চাল মোটা, ভাত ভাল, মুড়ি খুব ভাল হয়। বিচালি লম্বা, মোটা, ঘর ছাওয়ায় সুবিধাজনক। ৩) কবিরাজশাল — চাল মিহি সরু, সুন্দর ভাত হয়, বিচালি লম্বা। ৪) করিমশাল — কার্তিকশালের থেকে সরু। একটু দেরিতে থাকে। ৫) কার্ত্তিক শাল — কার্ত্তিক মাসে ওঠে জলদি জাত, চাল সরু, খড় ভাল, ফলন ৬/৭ মণ। ৬) কামিনীভোগ — সুগন্ধি, তবে আয়েশী ধান, কষ্ট সহ্য করতে পারে না। সব সময় জল-কাদাভাবে থাকতে হবে, ফলন বিঘার ৩/৪ মণ। ৭) খাজরথরী — মুড়ির ধান হিসাবে জনপ্রিয়। ৮) খেজুর ছড়ি — চাল ছোট, গোল, ভাত ভালো। খড় লম্বা, খই ভালো হয়। ৯) ফাঁপড়ি কেলে মিশ্র চাষ হত আমনের সঙ্গে, আমন বীজের সঙ্গে বুনত, ফলন— ৫/৬ মণ। ১০) গোবিন্দভোগ — সুগন্ধি, তবে আয়েশী ধান, কষ্ট সহ্য করতে পারে না। সব সময় জমিতে জল-কাদাভাব থাকতে হবে, ফলন বিঘায় ৩/৪ মণ। ১২) গোলগেতি — মাঝারি-জলদি জাত, বিচালি ভাল। ১৩) চামরমণি — চাল সরু, সুস্বাদু, বাজার দর ১৫ টাকা কিলো। ১৪) চূর্ণকাঠি — চিকন ধান, খরা পরিবেশেও চাষ হয়। পাহাড়ের ঢালে হয়, খাওয়ার পক্ষে উপযোগী, বিচালি ভালো। ফলন — ৫/৬ মণ। ১৫) জলকামিনী — জল যত বাড়ে ওরাও তত বাড়ে, খড় লম্বা, বিলের ধান। নৌকায় গিয়ে ধানের আগা কেটে নিয়ে আসে। চাল মোটা, স্বাদে ভালো, ফলন — বিঘায়- ৫/৬ মণ। ১৬) জংলীজটা — ধান কালো, চাল মোটা, সুস্বাদু, বিচালি ছোট, মাংস ভাত জনপ্রিয়। ১৭) ঝিঙেশাল — চাল মিহি সরু, সুন্দর ভাত হয়, বিচালি লম্বা। ১৮) তিলককাঠি — মাঝারি-জলদি ভাত, বিচালি ভাল। ১৯) দাদখানি — লাল রং ধান, চাল সাদা, খেতে খুব সুস্বাদু। ফলন খুব কম। চাষ করাও বেশ কঠিন। ২০) দুধকলমা — চাল মিহি সরু, সুন্দর ভাত হয়, বিচালি লম্বা। ২১) নোনা — চাল মোটা, ভাত ভাল, মুড়ি খুব ভাল হয়, বিচালি লম্বা, মোটা, ঘর ছাওয়ায় সুবিধাজনক। ২২) পাটনাই — চাল মোটা, লম্বা। ভাত ভাল, খড় ভাল। ফলন ৬/৭ মণ প্রতি বিঘায়। ২৩) পানুটি — কম জলে চাষ হয়, ধান মাঝামাঝি। ২৫) পেসারি পাটনাই — চাষের সময় বেশি লাগে, বিচালি - খুব বড়। ধান লম্বা, বড়ান। পেসারিও বলে। (পাটনাই - মানে লম্বা)। ২৬) বগিলাল — পাটনাই- খুব মোটা ধান, বড়, লম্বা। ২৭) ২২শে কুড়ি — চাল মোটা, ভাত ভাল, মুনি খুব ভাল হয়, বিচালি লম্বা, মোটা, ঘর ছাওয়ায় সুবিধাজনক। ২৯) বাসমতী — চালের জগতের রানী বলা যায়। সুগন্ধি ও সুস্বাদু। ৩১) বাদ কলমকাঠি — চিকন ধান, খরা পরিবেশও চাষ হয়। পাহাড়ের ঢালে হয়, খাওয়ার পক্ষে উপযোগী, বিচালি ভাল। ফলন- ৫/৬ মণ। ৩২) বিশফুলে — মুড়ির ধান হিসাবে জনপ্রিয়। ৩৩) বেগুনবীচি — খুব ছোট ধান, গোবিন্দভোগের মতো গোল। ৩৪) বিশফুলে — মুড়ির ধান হিসাবে জনপ্রিয়। ৩৫) রামশাল — বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে ভাল হয়, লঘুশালের কাছাকাছি। ধানের গায়ে লম্বা শুঁড় বা সারা গায়ে শুঁয়োর মতো থাকে। ধান- সাদা, লম্বা, জনপ্রিয়। ৩৬) লক্ষীকাজল — চাল সরু, ভাত ভালো

এরপর ৭ পাতায়

হারিয়ে যাওয়া ধানের খোঁজে

৬ পাতার পর

(পোলাও হবে), খই ভালো হয়। ৩৭) লঘুশাল — জলাভাবে শুকিয়ে ওঠে, জল পেলে ফের সজীব হয়। এই ধান চাষীর পয়া। রোপণ করলে কিছু ফলন দেবেই। খড় ভালো, চাল, মুড়ি ভাল, আতপ চাল হিসাবেও ব্যবহৃত। ৩৮) লাঠিশাল (বোরো) — চাল মোটা, খড় ভাল, মুড়ি, খই হয়। ৩৯) শোলের পোনা — চাল মোটা, ধান দেখতে শোল মাছের চারা পোনা যেমন দেখতে, তেমন। মুড়ি, খই হয়। ৪০) হলদিগুঁড়ি — চাল মোটা, ভাত ভাল, মুড়ি খুব ভাল হয়, বিচালি লম্বা, মোটা, খর ছাওয়ায় সুবিধাজনক। ৪২) হামাই ধান — মুড়ি বিখ্যাত। দঃ ২৪ পরগণায় চাষ বেশি হয়। চাল একটু মোটা (কোলে মোটা)। ৪৩) গুটলে — জল সহ্য করতে পারে। মোটা ধান। ফলন ভালো।

(খ) আউশ ধান (ডাঙাজমিতে বোনা বা ছড়ানো, প্রকৃতির জলের উপর নির্ভরশীল, বৈশাখে ছড়ানো - ভাদ্র মাসে ওঠে) ১) আগুনবান — একটু মোটা ধরনের, ধান- লাল টকটকে, ফলন- ৬/১০ মণ। (সূর্যমণি) ভাদ্র মাসে ওঠে। ২) কটকতারা — ধান লাল, খুব সুন্দর গন্ধ, ধান সেদ্ধ করার সময় ভুরভুরে গন্ধে বাড়ি ভরে যায়। ৩) কপিলেশ্বর — মাঝারি- লম্বা, নাম করা ধান, খেতে সুস্বাদু, ফলন- ৬/৭ মণ, ভাদ্র মাসের শেষে ধান ওঠে। ৪) কেলেপরাঙ্গী— খুব কালো ধান। গোছা মোটা, ফলন- ৫/৭ মণ। জলদি জাত, বৈশাখে বুনলে শ্রাবণে উঠতো। ৫) কেলেবোরা — জলদি জাত, মোটা ধান, বিচালি ভাল। তবে বেঁটে গড়ন, ফলন ৫/৭ মণ, মিশ্র চাষ হত আমনের সঙ্গে। ৬) তুলসি শাল — মোটা ধান। কৃষক বাঁচানো ধান। সাদা, লম্বায় মানুষ সমান, ফলন ভালো (৬/৭ মণ), ভাদ্র মাসে ওঠে। ৭) নোড়ই — গা লালচে, সাদাটে ভাব। ৮) পিঁপড়েকেলে — জলদি জাত, শ্রাবণ মাসে ওঠে, ফলন ৫/৭ মণ। ৯) (ফাঁপড়ি কেলে) মিশ্র চাষ হত আমনের সঙ্গে, আমন বীজের সঙ্গে বুনত, ফলন- ৫/৬ মণ। ১০) মদনগেড়ে — ধানের রং উজ্জ্বল। ১১) রূয়েকেলে — জলদি জাত, মোটা ধান, বিচালি ভাল, তবে বেঁটে গড়ন, ফলন ৫/৭ মণ, মিশ্র চাষ হত আমনের সঙ্গে। ১২) লতাভোগ — ভাত মিষ্টি, মুড়ি, চিঁড়ে ভালো, মাড়াই করে পল তৈরি করে গাদা দেওয়া হোত। ১৩) লালবোরো — জলদি জাত, মোটা ধান, বিচালি ভাল, তবে বেঁটে গড়ন, ফলন ৫/৭ মণ, মিশ্র চাষ হত আমনের সঙ্গে। ১৪) লেবু খোল — চালে লেবুর গন্ধ পাওয়া যায়। ১৫) শ্রীটি — ভাত মিষ্টি, মুড়ি, চিঁড়ে ভালো, মাড়াই করে পল তৈরি করে সাদা দেওয়া হোত।

প্রকৃতির এইসব মেটা জাত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করতে হবে। হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। এইসব জাত রোগ পোকার আক্রমণ সহ্য করতে পারে। কয়েকশত বৎসর ধরে এদের চাষ করায়, এদের প্রকৃতি রক্ষাশীল। বিজ্ঞান ক্লাব সদস্যরা, প্রকৃতিপ্রেমীরা- এইসব চাষ যাতে নিয়মিত ভাবে হয়, সেদিকে নজর দিন, প্রচার করুন, চাষী ভাইদের বোঝান। অল্প জমিতে হৈসব দেশি ধানের চাষ জিইয়ে রাখতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। একবার হারিয়ে গেলে, বিজ্ঞান আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না এইসব অমূল্য সম্পদ। উচ্চফলনশীল হাইব্রিড চাষের পাশাপাশি এদেরও টিকিয়ে রাখতে হবে জীব বৈচিত্র্য রক্ষার তাগিদে।

— দীপক কুমার দাঁ, ৯৪৭৪১৯২৭৯৯

ধান গাছের পোকা

৫ পাতার পর

এইভাবে এরা একসময় পাতার গোড়ায় পৌঁছে যায় এবং ধানগাছের কান্ড ভেধ করে মজ্জার মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর, মজা করে ভিতরের শাঁসটা খেতে থাকে।

এর ফলে ধান গাছের ডগা শুকিয়ে যায় এবং কচিপাতাগুলি ক্রমশ কুঁকড়ে যেতে থাকে। শিষ বেরোয় মরা। আর তাতে ধান থাকলেও সেই ধান হয় ঠিটা। অর্থাৎ তার মধ্যে চালের দানা থাকে না। আর একটা কথা। শুঁয়াপোকা একটা শিষ ধ্বংস করার পর সেটা ছেড়ে ওই গাছেরই অন্য একটা শিষে চলে যায় এবং তাকে আক্রমণ করে। অথবা অন্য কোনো গাছে চলে যায় এবং তারই একটা শিষকে আক্রমণ করে। এইভাবে ২০-৩০ দিন ধরে খেয়ে খেয়ে শুঁয়োপোকাটি বেশ পুষ্ট হয়ে ওঠে। তখন তা দেখতে হয় বেশ মসৃণ, গায়ের রঙ হলদেটে সাদা এবং প্রায় ২-৫ সেমি লম্বা। এইবার পূর্ণাঙ্গ মথে রূপান্তরিত হলে সে যাতে বেরিয়ে যেতে পারে, সেজন্য একটি ছিদ্র তৈরি করে। তারপর ওই কান্ডের ভিতরেই একটি গুটি তৈরি করে তার মধ্যে পুত্তলি অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকে। এর ৯-১২ দিন পরে সে পূর্ণাঙ্গ মথে রূপান্তরিত হয়ে এবং এই ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের অবস্থানুযায়ী এই জীবনচক্র সম্পূর্ণ হতে ৩৮-৫৫ দিন পর্যন্ত সময় লাগে।

ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ — শূককীট বা শুঁয়াপোকা অবস্থায় এর ফসলের দারুণ ক্ষতি করে। এরা ছিদ্র করে কোমল কান্ডের একেবারে গোড়ায় শিকড়ের কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছে যায়। এর ফলে কোমল বিটপ (Shoot) টি শুকিয়ে যায়। এজন্য তখন সেই আগা ধরে টান দিলে, সেটি আলগা হয়ে উঠে আসে। প্রথম দিকে গাছের একেবারে শৈশবে আক্রান্ত হলে গাছটা মরে যায়। আর গাছে ফুল ফোটার আগে আক্রান্ত হলে গাছটা মরে না কিন্তু ধানের শিষ শুকিয়ে যায় এবং ধান ঠিটা হয়ে যায়। অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো দানা থাকে না।

প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ : (১) ০.৮ শতাংশ মিথাইল প্যারাথয়েন (Methyl Parathion) ০.০৫ শতাংশ ফসফ্যামিডন (Phosphamidon), ০.৬ শতাংশ ডায়াজিয়ন (Diazion) ২০-৩০ দিন অন্তর, স্প্রে করলে এই পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। (২) ধান ক্ষেতে কমপক্ষে ১৫ সেমি উচ্চতা পর্যন্ত জল দাঁড়িয়ে থাকলে এবং হেক্টর প্রতি ১২ কেজি ৬ শতাংশ লিনডেন (Lindane) দানা ছিটিয়ে দিলে, সুফল পাওয়া যায়। ৩০ দিন অন্তর, অন্তত তিনবার এই ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার। (৩) ফসল তোলার পর ধানর ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে ধান গাছের মাথাগুলি সব মাটির নিচে চা দিয়ে রাখতে হবে। তাহলে শূককীটগুলি সব মরে যাবে। (৪) তারপর ধানের মাথাগুলি সব একজায়গায় জড়ো করে, ঢিবি বানিয়ে, তাতে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। তাহলে শীতঘুমে আচ্ছন্ন কীটগুলি সব পুড়ে মরে যাবে। (৫) এই পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে এইরকম প্রজাতির ধান নির্বাচন করে তারই চাষ করলে সব দিক দিয়ে ভাল হয়।

— শৈবাল কুমার গুহ, ০৩৩-২৫৫৬৩৯১০

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কীটপতঙ্গের কথা — অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় গুহ (পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ)

লবনে আয়োডিন

১ পাতার পর

শাকসব্জি, ফল, চাল, গম, নানারকম দানাশস্য ইত্যাদি থেকে পেয়ে যাই। এছাড়া আমরা যে বিশুদ্ধ জল পান করি তাতে আয়োডিনও থাকে। শরীর সুস্থ রাখতে আমাদের দিনে প্রায় তিনগ্রামের মত এইসব লবনই যথেষ্ট। তবুও যেসব পুষ্টিকর খাবার প্রতিদিন খাই তাতে ১০ গ্রামের মত লবন বা তার বেশি শরীরে চলে যায়। সুদৃশ্য মোড়কে যে লবন বাজার থেকে কিনে আনছি সেই লবন (Nacl) সোডিয়াম ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিশ্রণে তৈরি হয়। সোডিয়াম, ক্লোরিন এবং আয়োডিন যখন আলাদাভাবে প্রতিদিনকার খাদ্যের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি, তখন অনর্থক বেশি পয়সা খরচ করে বাজারে চালু আয়োডিনযুক্ত লবন বাড়তিভাবে শরীরে চালান দেওয়ার কোন মানে আছে কি? সুস্থ মানুষের কিডনি সারাদিনে ৪ থেকে ৫ গ্রামের মত লবন শরীর থেকে বের করতে পারে না। ফলে যে অতিরিক্ত কেনা লবন আমরা দিনের পর দিন খেয়ে যাচ্ছি তা মোটেই শরীর থেকে বের হওয়ার সুযোগ পায় না। ফলে এই রাসায়নিক লবন কিডনির স্বাভাবিক কাজ বিঘ্নিত করে আর শরীরে অন্যান্য কাজে জটিলতা বাড়িয়ে তোলে। সাধারণ লবন খাওয়ার ফলে শরীরে ভিটামিনগুলোকে তা নষ্ট করে দেয়, চর্মরোগ, হাইপ্রেসার, গেঁটেবাত বা গাউট ইত্যাদির মত রোগের সৃষ্টি করে। দেখা যাচ্ছে আজকালকার মানুষ কিন্তু এইসব রোগে বেশি ভুগছে। মানুষসহ সকল মেরুদন্ডী প্রাণীদের শ্বাসনালীর উপরিভাগে স্বরযন্ত্রের নিচে আছে একটিমাত্র থাইরয়েড গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে যেসকল হরমোন নিঃসৃত হয় তার মধ্যে থাইরক্সিন অন্যতম। এই হরমোন হল আয়োডিনযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড। অর্থাৎ থাইরক্সিন তৈরিতে আয়োডিন দরকার পড়ে। তৈরির ব্যাপারে অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিন ও খাদ্যগামগ্রীর আয়োডিন বিশেষ প্রক্রিয়ায় মেশে। থাইরক্সিন হরমোন তৈরি ও গ্রন্থি থেকে বেরোবার ব্যাপারে মস্তিষ্কে অবস্থিত পিটুইটারি গ্রন্থির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আসলে এই গ্রন্থির থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (সংক্ষেপে T.S.H) থাইরয়েডের অভিভাবকের কাজ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন সাধারণ মাত্রার বেশি নিঃসৃত হলে গ্রেভস্ ডিজিজ (Graves disease) বা এক্সঅপত্যালমিক গয়টার (exoptholmic goitre) রোগ হয়। ফলে মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে ওঠে ও চোখ দুটো ঠেলে যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। চোখের পাতা কম ওঠানামা করে, হৃৎপিন্ডের স্পন্দন হার বেড়ে যায়, প্রস্রাব ঘন ঘন হয়। দেহের ওজন কমে যায়। আবার থাইরক্সিনের কম ক্ষরণেও আছে বিপত্তি। কম ক্ষরণে শিশুদের ক্রেটিনিজম (cretisism) ও বয়স্কদের মিক্সিডিমা (myxoedem) রোগ হয়। এইসব রোগ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে 'নির্দিষ্ট পরিমাণ' আয়োডিন। অন্যদিকে দেহে শুধুমাত্র আয়োডিন নির্দিষ্ট পরিমাণের কম হলে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায় এবং এই অবস্থাকে সাধারণ গলগন্ড (simple goitre) বলে থাকি। থাইরক্সিন হরমোন কম বা বেশি পরিমাণ নিঃসৃত হলে যেসব লক্ষণ শরীরে প্রকাশিত হয়, তা গলগন্ডের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না। এখানে শুধু থাইরয়েড গ্রন্থি স্ফীত হওয়ার ফলে আশপাশের অন্যান্য অঙ্গগুলোর উপর চাপ বাড়ে। সেই চাপে কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যেসব স্থানের পানীয় জলে ও খাবারেআয়োডিন কম থাকে, সেইসব স্থানের লোকেদের এই সকল প্রকৃতির গলগন্ড দেখা যায়। সমুদ্রতীরবর্তী ও তার আশপাশ এলাকার (যেমন- প. বঙ্গ, উড়িষ্যা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলের) শাকসব্জি, ফলপাকুড়, জল ইত্যাদিতে ব্যাপক সন্ধান মেলে আয়োডিনের। এখানকার মানুষের আয়োডিনের ঘাটতি এখনই থাকে না। তাই বাইরে থেকে লবনের সাথে আয়োডিন শরীরে যোগান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল ছাড়িয়ে বহু দূরের অঞ্চলে বা ঊষর বন্ধ্যা অঞ্চলের জল, ফল, শাকসব্জিতে আয়োডিন ততটা নেই। ফলে সেদিকার লোকেদের সত্যিই আয়োডিনের ঘাটতি দেখা যায়। এক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন ধরে শরীরে আয়োডিন কম থাকলে থাইরক্সিন হরমোন তৈরির কাজ কমে যায়। সেইজন্য উঃ পূর্ব ভারতের পার্বত্য এলাকায় গলগন্ড রোগী প্রচুর দেখা যায়। এইসব এলাকায় পরিমিত শাকসব্জি, ফল ইত্যাদি গ্রহণেও আয়োডিনের অভাব থাকলে বাইলে থেকে তা যোগান দেবার প্রয়োজন আছে। আমাদের জেনে রাখা দরকার সাধারণ লবনে অশুদ্ধি হিসেবে সামান্য মাত্রায় আয়োডিন থাকে। ব্যবসায়িক খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় প্রস্তুতকারক লবনে আয়োডিন মিশিয়ে বাজারে ছেড়েছে, তাহলেও অনেক কোম্পানীর প্যাকেটে কোথাও লেখা থাকে না কতটা পরিমাণ আয়োডিন লবনে মেশানো আছে আর আমাদের শরীরে কতটা দরকার। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের জানার অধিকার আছে। না জানতে পারার জন্য কিন্তু আমরাই দায়ী। আমরাই তাদের এভাবে ব্যবসা চালাতে সাহায্য করছি। সামান্য তথ্যটুকু জানার জন্য প্রতিবাদও করছি না। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে আয়োডিন না মিশিয়েই সকলের অলক্ষ্যে আমাদের দিনের পর দিন ঠকিয়ে চলেছে। না হলে লবনের প্যাকেটে আয়োডিনের পরিমাণটুকু লিখে ক্রেতাদের কাছে সততাবোধের পরিচয়টুকু দিতে পারে না কেন? আসলে 'আয়োডিনাইজড সল্ট' কথাটা একটা ব্যবসায়িক ফাঁদ মাত্র। আর এই ফাঁদে আমরা জড়িয়ে গেছি। প্রসঙ্গত, ভারতের আয়োডিন ঘাটতি এলাকায় বার্ষিক যে পরিমাণ আযোডিন সমৃদ্ধ লবনের দরকার তার পরিমাণ, ভারতের মোট লবনের বাৎসরিক উৎপাদনের চেয়েও বেশি। অথচ মজার ব্যাপার লবন প্রস্তুতকারক ও ব্যবসাদাররা যেসব অঞ্চলে এই লবনের দরকার নেই সেখানেও আয়োডিনযুক্ত লবন রমরমিয়ে বিক্রি করে চলেছে। বেশিরভাগ মানুষের সম্যক বুদ্ধির অভাবেই ব্যবসাদাররা তাদের এইভাবে ঠকিয়ে মুনাফা লুটে নিচ্ছে — যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। আগেই বলা হয়েছে সাধারণ লবনেও মিশে থাকে আয়োডিন, আকরিক আসঙ্গে। তাই সব জায়গার লবনে আয়োডিন বাইরে থেকে মেশানোর দরকার পড়ে না। ভারত সরকার কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল চিহ্নিত করে সেসব জায়গার লবনে আয়োডিন রাখার কথা ঘোষণা করেছে। সব জায়গায় নয়। আমাদের পঃ বঙ্গের সমতল অংশে আয়োডিনযুক্ত লবনের দরকার নেই। তাই আমরা, পঃ বঙ্গবাসীরা সাধারণ লবন বা আয়োডিনযুক্ত লবন থেকে যতটা দূরে সরে থাকতে পারবো ততই মঙ্গল। — তুষারকান্তি গলুই, ৯৪৭৪৭৭৮৮৫২

যোগাযোগ — বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো ঃ কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৮৪৬০৭৭৭, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২ ।

সম্পাদক মন্ডলী — সুরজিৎ পাল, পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত ।

সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। *(ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)* **E.mail-** *ganabijnan@yahoo.co.in*